আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লিপি - সমস্যা

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের নানা দেশে অসংখ্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বাস। যাকে আমরা আজ 'সভ্য' দুনিয়া হিসেবে জানি সেইসব দেশের ভাষা ও সংস্কৃতির আদি বুনিয়াদ গড়ে তুলেছিলেন আদিবাসী মানুষ। এইসব গোষ্ঠীর সাহিত্য মৌখিকঐতিহ্যবাহিত। শত সহস্র বছর ধরে আদিবাসীদের মধ্যে যেসব লোকপুরাণ, লোকসংগীত, রূপকথা, নীতিকথা, কিংবদন্তি, পরিকথা, পশুকথা, ছড়া-ধাঁধা-প্রবাদ-প্রবচন, গীতিকা বহতা নদীর মতো বয়ে এসেছে তা সবই মৌখিক পরম্পরায় শ্রুতিনির্ভর। এসব লৌকিক মৌখিক সাহিত্যের বৈভব দেখলে বিস্মিত হতে হয়। আদিবাসীদের এইসব মৌখিক সাহিত্য নানা দেশের ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের মধ্যে শুধু অনুপ্রবিষ্ট হয়নি, তাকে প্রভাবিতও করেছে। রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড ওডিসি গিলগামেশ পুরাণ প্রভৃতির মদ্যে আদিবাসীদের সৃষ্ট অসংখ্য অনন্য কাহিনীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ওল্ড স্টেস্টামেন্টের অনেক গল্পও উঠে এসেছে আদিবাসীদের মৌখিক ঐতিহ্য থেকে।

প্রাচীনকাল থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত আদিবাসীদের মধ্যে প্রথাগত শিক্ষার কোনো স্থান ছিল না। তাঁরা নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু অশিক্ষিত নন। সংহত সমাজের মানুষ হিসেবে তাঁরা সামাজিক - পরিবারিক জ্ঞান, জীবিকার পদ্ধতি, সহজসরল নৈতিক জীবনধারণের মহৎ শিক্ষা প্রভৃতি পেতেন বয়স্কদের কাছ থেকে। আদিবাসীদের সমাজ সংগঠন ও পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা ছিল অতি উন্নত ধরনের। আজও রয়েছে। সামাজিক শিক্ষা তাঁদের সৎ, বিবেকবান, পরিশ্রমী, বিনয়ী, সৃষ্টিশীল, দৃঢ় ও উদার হতে সাহায্য করত। আজও যেসব এলাকায় বাইরের ঢেউ এসে তাঁদের সমাজকে টালমাটাল করে দেয়নি, সেখানে এইসব মহৎ গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু সাহিত্য মৌখিক ঐতিহ্য - নির্ভর হওযাতে আদিবাসি সমাজে লিপির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। পৃথিবীর অতি অল্প আদিবাসী গোষ্ঠীর নিজস্ব লিপি রয়েছে। তাও বোধহয় গোটা পাঁচেক হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের উখের আদিবাসীদেরই কেবল সুস্পষ্ট লিপি রয়েছে। লিপি না থাকলেও সৃষ্টিশীল সাহিত্য - রচনায় আদিবাসী সমাজ কোনোকালে পিছিয়ে ছিলেন না।

কিন্তু প্রশ্ন, আদিবাসীদের মধ্যে কীভাবে লিপিসমস্যা এল, কেনই বা এল আর তার ফলে কি কি বিপর্যয় ঘটে গেল, এই অনুসন্ধান জরুরি।

যে কয়েকটি আদিবাসী গোষ্ঠীর লিপি অনেক কাল আগে থেকে রয়েছে, সে প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র। লিপি থাকলেও সেগুলো যে খুব ব্যবহৃত হত এমন দৃষ্টান্ত কম। কিন্তু আদিবাসীদের মধ্যে লিপি - ব্যবহার ও উপনিবেশবাদের সঙ্গে সম্পর্ক বড় নিবিড়। ইউরোপীয় দেশগুলি যেমন গ্রেট ব্রিটেন, পোর্তুগাল, স্পেন, ডেনমার্ক, জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ যখন এশিয়া - আফ্রিকার নানা দেশে, অস্ট্রেলিযায়, মেলানেশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া, পলিনেশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু করল তখন থেকেই সর্বনাশের সূচনা হল।

কলম্বাস, বাস্কো - ডা-গামা, ম্যাজেলান, আলবারো, মেনডানা, ক্যাপ্টেন আর্থার ফিলিপ প্রভৃতি অভিযাত্রী আমেরিকা ভারতবর্ষ মেলানেশিয়া আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করতে আসে। ছেলেবেলায় ভূগোল বইতে এদের কথা পড়ে আমরা উদ্দীপিত হতাম। কিন্তু এরা আসলে জলদস্যু, নৃশংস, হত্যাকারী, অমানবিক, রক্তলোপুপ এবং বাণিজ্য ও দখলদারির জন্য এমন কোনো হীন কাজ নেই যা তারা করতে দ্বিধা করেছে। শত - সহস্র - লক্ষ মানুষকে হত্যা করে এরা উপনিবেশ স্থাপন করে। সেইসব দেশ পদানত হওয়ার পরে তারা শাসনভার গ্রহণ করে। সব মানুষকে মেরে ফেললে তো চলে না, তাই যারা বেঁচে রইলেন তাদের মধ্যেই শাসন - শোষণ চলতে লাগল।

সব সমাজেই কিছু ভালো মানুষ থাকেন। ইউরোপীয় খ্রিস্টীয় পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেক উদার মানুষ ছিলেন। তাঁরা আদিবাসীদের জন্য যেমন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করেন, তেমনি লেখাপড়া শেখানোর বন্দোবস্তও করেন। এই ভাবনা অভিপ্রেত।

কিন্তু শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শর্ত লিপি। আদিবাসীদের তো লিপি নেই। তাই এইসব ইউরোপীয় শিক্ষাবিদেরা নিজেদের দেশের লিপিতে আদিবাসীদের মধ্যে প্রথাগত শিক্ষার প্রচলন করেন। যে যে দেশের উপনিবেশ, সেখানে সেই সেই লিপি ব্যবহৃত হতে থাকে। ইংরেজি, ফরাসি, ইতালীয়, জার্মান, স্প্যানিশ, ডাচ প্রভৃতি ভাষার লিপির মাধ্যমেই আদিবাসীদের শিক্ষার প্রচল ঘটে। একটি উপনিবেশে অনেক আঞ্চলিক ভাষাভাষী আদিবাসী থাকতে পারেন। কিন্তু শিক্ষাদান যেহেতু একটি ইউরোপীয় ভাষায় হচ্ছে, তাই সেখানে জটিলতা কম।

এবার ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের প্রসঙ্গে আলোচনা করছি। গ্রেট ব্রিটেনের উপনিবেশ ভারতবর্ষ। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান শুরু করলেন খ্রিস্টীয় পুরোহিতরা। আর আদিবাসীদের মৌখিক সাহিত্য অর্থাৎ মিথ, রূপকথা, ছাড়া, সংগীত, প্রবাদ, ধাঁধা প্রভৃতি যে সংকলন প্রকাশ করলেন তা আদিবাসী ভাষায়। কিন্তু যেহেতু লিপি নেই তাই রোমান হরফে সেগুলো প্রকাশিত হত।

পরাধীন ভারতবর্ষে এ বিষয়ে তেমন জটিলতা সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বিষয়টি অন্য মাত্রা পেল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। পার্শ্ববর্তী রাজ্যের কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়বে। তখনও নতুন লিপির প্রসঙ্গ আসেনি। সাঁওতাল আদিবাসীদের কথাই বলব। কেননা, তাঁরাই পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় আদিবাসী জনগোষ্ঠী।

স্বাধীন ভারতে সাঁওতাল আদিবাসী ছেলেমেয়েরা স্কুলে ভর্তি হয়ে বাংলা লিপিতে পড়াশোনা করত। খ্রিস্টান গির্জার অধীনে যেমন স্কুল ছিল সেখানে ছাত্রছাত্রীরা রোমান হরফে নিজেদের ভাষায় মৌখিক সাহিত্য পড়ত। আবার বিহারের সাঁওতাল আদিবাসী নাগরি লিপিতে এবং অসমের সাঁওতাল আদিবাসী অসমীয়া হরফে লেখাপড়া করত। সবাই জানেন, এক সময় ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা থেকে অসংখ্য সাঁওতাল আদিবাসী ডুয়ার্স, দার্জিলিং ও অসমের চা - বাগিচায় জুলি - জামিন হয়ে গিয়েছিলেন। এই মাইগ্রেশনের ফলে সাঁওতাল আদিবাসী জীবনে ব্যাপক বিপর্যয় দেখা দেয়। যাঁরা ছিলেন মূলত কৃষিজীবী ও অরণ্যচারী তাঁরা হয়ে পড়লেন চা - বাগিচার শ্রমিক। পুরুষানুক্রমে একদিন সেই জীবনকে তাঁরা মেনে নিতে বাধ্য হলেন। অরণ্যের সংস্কৃতির সঙ্গে যাঁরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন হাজার হাজার বছর ধরে, তারা সেই আদিবসতি থেকে বিচ্যুত হয়ে নতুন উপনিবেশে জীবন শুরু করলেন। বলা ভালো, বাধ্য হলেন। স্বদেশ স্বভূমি থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এ এক নতুন যন্ত্রণার জীবন। কিন্তু যাঁরা প্রথম গেলেন তাঁদের যন্ত্রণা এক ধরনের। আর পরের প্রজন্মের যন্ত্রণা অন্য ধরনের। কেমন সেই যন্ত্রণা?

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে ১ এপ্রিল থেকে তিনদিন ধরে একটি আদিবাসী কনভেনশন হয় বাঁকুড়া জেলার রায়পুরে। রায়পুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলা থেকে শতাধিক সাঁওতাল প্রতিনিধি সেখানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আদিবাসী লেখালেখির সুবাদে আদিবাসী বিশেষজ্ঞ অমলকুমার দাস, সুহৃদকুমার ভৌমিক, ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে এবং আমিও আমন্ত্রণ পেয়ে সেই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলাম। দুদিনে খুব সমৃদ্ধ বিস্মিত হয়েছিলাম, যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েছিলাম।

একই ভাষা, মাতৃভাষা সর্বক্ষণের ব্যবহৃত ভাষা— সাঁওতালি ভাষা দুই অঞ্চলের মানুষ বুঝতে পারছেন না। শতবর্ষের ব্যবধানে ভাষা - সংস্কৃতিতে বিবর্তন ঘটে গেল। ভাষার উত্তরাধিকার এক হয়েও এভাবেই তাঁদের ভাষা - সংস্কৃতিতে বিবর্তন ঘটে গেল। যদি একটি সার্বজনীন লিপি থাকত, প্রকাশিত গ্রন্থাদি পত্রপত্রিকার মাধ্যমে যদি সেগুলি ছড়িয়ে পড়ত এসবের মাধ্যমে নিত্য আদানপ্রদান ঘটত তাহলে ভাষার ক্ষেত্রে এই বিপন্নতা ঘটত না।

আর একটি লিপি গৃহীত হয়েও সর্ব রাজ্যে স্বীকৃত না হয়েও বিপর্যয় ঘটে গেল।

সাঁওতাল আদিবাসী জনগোষ্ঠী বেশ কিছুকাল আগে থেকেই সাঁওতাল পরগনা ছোটনাগপুর এলাকা থেকে সাম্প্রতিক কালের

ঝাড়খণ্ড বিহার পশ্চিমবঙ্গ অসম রাজ্যের বিপুল সংখ্যায় বসবাস করেন। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গে ও অসমে এরা মূলত থাকেন চা-বাগিচা এলাকায়। ভারতের এই যে বিস্তীর্ণ এলাকায় সাঁওতাল আদিবাসীরা ছড়িয়ে রয়েছেন একই লিপির মাধ্যমে পড়াশোনা করার সুযোগ না থাকায় তাঁদের মধ্যে কোনো মননগত ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক - সমাজিক - ভাষাগত - পালাপার্বণগত -ধর্মীয় উত্তরাধিকার এক হওয়া সত্ত্বেও কোনো মানসিক - মানবিক সেতু সৃষ্টি হয়নি।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। এখন ঝাড়খণ্ড রাজ্য, কিন্তু তখন ছিল বিহার রাজ্যে। বছর পঁচিশ আগের অভিজ্ঞতা। গিরিডি শহর থেকে মাইল কয়েক দূরে বেনিয়াডি। সেখানে রয়েছে কয়লাখনি ও ভারতের প্রাচীনতম কোক ওভেন। শ্রমিক অধিকাংশই সাঁওতাল ও মুন্ডা আদিবাসী। আমার এক পিসতুতো ভাই কোক ওভেনে চাকরি করতেন। সেই সুবাদে বহুবার বেনিয়াডি গিয়েছি। পরিচয় হয়েছিল মঙ্গলচন্দ্র সরেনের সঙ্গে। বেনিয়াডির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বাবা - মা দশরথ ও তুলসী সরেন কোক ওভেনের কুলি - কামিন ছিলেন। বাবা - মায়ের আগ্রহে পুত্র লেখাপড়া শিখে শিক্ষক হয়েছেন। গিরিডি কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে শিক্ষকতা করেছেন। এমন পড়াপাগল যুবক আমি খুব কম দেখেছি। আশ্চর্য নিষ্ঠায় হাজার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সাহিত্য পড়তে তার জুড়ি নেই। যেহেতু তিনি তৎকালীন বিহারের বাসিন্দা, তাই হিন্দিতে পড়েছেন, সাঁওতালি সাহিত্যও পড়েছেন নাগরি লিপিতে। একদিন মঙ্গচন্দ্র বললেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে সাঁওতালি ভাষায় কত পত্রপত্রিকা গ্রন্থ বেরোয়, এসব শুনেছি। কিন্তুসেসব তো পড়বার ক্ষমতা নেই, আমিতো বাংলা লিপি পড়তে শিখিনি।

গত শতকের সত্তরের দশকে ওড়িশার কটক শহরে মাসখানেক ছিলাম। আমার ভাই ওখানে চাকরি করত। গরমের ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ভাইয়ের বাড়ির পাশেই থাকতেন সুভাষকুমার কিস্কু। তিনি জন্মেছেন ওড়িশাতে। লেখাপড়া কটকে। কটক কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে দক্ষিণ - পূর্ব রেলের টিকিট পরীক্ষক। ভুবনেশ্বরে কর্মরত। কটক থেকে নিত্যদিন যাতায়াত করেন। এক মাসে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, প্রতিবেশী হিসেবে। তিনি একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পত্রিকার ভাষা সাঁওতালী; লিপি ওড়িয়া। তিনি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালি সাহিত্য - সংস্কৃতি বিষয়ে অনেক পত্রিকার খবর রাখেন। কিছু সংগ্রহও করেছেন। কিন্তু সেগুলো পড়তে পারেন না, কেননা সেগুলো বাংলা লিপিতে প্রকাশিত।

মঙ্গলচন্দ্রের সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই সুভাষচন্দ্রের। একই ভাষা, একই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, একই ভাবাবেগ — কিন্তু শুধুমাত্র প্রথাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে লিপির বিভিন্নতায় এই সাঁওতাল জনগোষ্ঠী নিজদের সাহিত্য - পাঠে বিচ্ছিন্ন হয়ে রযেছেন। এ যে কি মর্মান্তিক ব্যবধান তা আমরা উপলব্ধি করতে অক্ষম।

এ তো গেল একটি আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে অভিন্ন লিপি না থাকবার সমস্যা আবার একটি লিপি প্রচলিত হয়েও সমস্যা মেটেনি।

আগেই বলেছি, পৃথিবী এবং ভারতের অধিকাংশ আদিবাসী গোষ্ঠীর মতো সাঁওতালদেরও কোনো লিপি ছিল না। গত শতকে ওড়িশার সাঁওতাল গবেষক - পন্ডিত সাধু রঘুনাথ মুর্মু সাঁওতালি ভাষার জন্য একটি লিপি আবিষ্কার করেন। নাম দেন অলচিকি। অনেক দিন থেকেই সাঁওতালি সমাজ থেকে এই লিপি প্রচলনের জন্য দাবি ওঠে, শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত শতকের সাতের দশকে এই অলিচিকিকে স্বীকৃতি দেন এবং বিদ্যালয় স্তরে এই লিপিতে পঠন - পাঠন শুরু হয়, অলচিকিতে যেসব পত্রপত্রিকা - সাহিত্য প্রকাশিত হতে থাকবে সেগুলো অভিন্ন ভাষা হওয়া সত্ত্বেও অন্য রাজ্যের সাঁওতাল আদিবাসীরা তা পড়তে পারবেন না। একটি লিপি গ্রাহ্য হয়েও সারস্বত - সাহিত্য এক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা দূর হল না, একই ব্যবধান রয়ে গেল।

আবার অনেক বিশিষ্ট সাঁওতাল প্রাজ্ঞ মানুষ অভিযোগ করেছেন, অলচিকি যেহেতু ওড়িশার সাধু রঘুনাথ মুর্মু আবিষ্কার করেছেন তাই এই লিপি গোলগোল, ওড়িয়া লিপির ছাপ রয়েছে। অন্য রাজ্যের সাঁওতাল অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ বিহার ঝাড়খণ্ড ও অসমের সাঁওতাল ছাত্রছাত্রী বাংলা নাগরি অসমীয়া লিপিতে পড়তে অভ্যস্ত। তারা এই নতুন লিপিতে পারঙ্গমতা অর্জন করতে অসুবিধায় পড়বে। শুধু তাই নয়, মাধ্যমিকের পরে উচ্চ - মাধ্যমিক ও স্নাতক - স্নাতকোত্তর স্তরে গিয়ে আবার ছাত্রছাত্রীদের অন্য লিপিতে অভ্যস্ত হতে হবে — কতগুলো লিপি তারা শিখবে?

অন্য সমস্যাও রয়েছে। এতক্ষণ সাঁওতাল আদিবাসীদের লিপির কথা বলেছি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আরও কিছু বড় আদিবাসী গোষ্ঠী রয়েছেন। তাদের অসুবিধা ও দাবির কথাও ভাবতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক। এই রাজ্যের চল্লিশটির মতো আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বাস। তাঁদের মধ্যে সাঁওতাল বৃহত্তম আদিবাসী গোষ্ঠী। জনসংখ্যা প্রায় পনেরো লক্ষ। এছাড়াও ওরাওঁ (তিন লক্ষ), কোড়া (এক লক্ষ), মুন্ডা (দুই লক্ষ), ভূমিজ (দুই লক্ষ) বেশ বড় গোষ্ঠী। এছাড়াও উত্তরবঙ্গে লেপচা রাভা মেচ ও ভুটিয়া আঞ্চলিক পরিধিতে বেশ প্রভাবশালী আদিবাসী জনগোষ্ঠী। সকলেরই মাতৃভাষায় শিক্ষালাভে অধিকার রয়েছে কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে একটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে যদি এই অধিকারের স্বীকৃতি জানাতে হয় তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষা ও লিপির প্রশ্নে ভয়াবহ নৈরাজ্য সৃষ্টি হতে বাধ্য বিশেষ করে শিশুরা কীভাবে এই নৈরাজ্যের শিকার হয়ে অসহায়তা বোধ করবে তা আমাদের ভাবতে হবে। কেননা, শিশুদের মতো এমন মানবসম্পদ সমাজে আর কেউ নেই।

আসলে আমাদের মতো বহু মাতৃভাষী দেশে এ এক ব্যাপক সমস্যা। সাংস্কৃতিক বিজ্ঞানী এবং ভাষাতাত্ত্বিকেরা এ বিষয়ে নানান সমাধানের পথ দেখিয়েছেন। আজকের পৃথিবীতে আর একটি সমস্যা ভয়াবহ আকার নিয়েছে। যেসব জনগোষ্ঠীর লিপি নেই কিংবা লিখিত ঐতিহ্য নেই তাদের মৌখিক ভাষাও হারিয়ে গিয়েছে এবং প্রতি বছর শত শত মৌখিক ভাষা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী ভাষার দাপটে বিলুপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুততর হচ্চে।

আমার মনে হয়েছে, নতুন করে আদিবাসী ভাষার লিপি আবিষ্কারের কোনো প্রয়োজন নেই। এমন কি সাঁওতালের অলচিকি প্রবর্তনেরও যৌক্তিকতা নেই। এভাবে কৃত্রিম উপায়ে কোনো ভাষা ও লিপিকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। আর উচ্চতর ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে অলচিকিতে পাঠ্যপুস্তকের অভাবের কারণে সাঁওতালদের এই লিপিতে প্রাথমিক - মাধ্যমিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা থাকতে বাধ্য। পরিণতিতে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতিই হবে।

ভারতের যে যে রাজ্যে আদিবাসী ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে , মেডিকেল কলেজে, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সেই সেই রাজ্যের প্রথাগত ঐতিহ্যবাহী লিপি ও ভাষায় পড়াশোনা করে আসছেন, তারা স্বাধীনতার পরে ষাট বছরে এই বিষয়ে ধাতস্থ হয়ে গিয়েছেন। প্রথাগত শিক্ষায় আদিবাসীদের অগ্রগতি এখন বেশ চোখে পড়ার মতো। অবশ্য যেসব এলাকায় সুযোগ রয়েছে সেখানকার আদিবাসিরা এগিয়ে চলেছেন। প্রযোজন সুযোগ আরও সম্প্রসারিত করা।

অর্থাৎ বাংলা, ওড়িয়া, তামিল, নাগরি, কর্নাটকি, তেলেগু, মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি লিপিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠী পড়াশোনা করেছেন। অন্য কোনো পথ নেই। আবার সঙ্গে সঙ্গে এইসব লিপির মাধ্যমে মাতৃভাষায় সহিত্য - সংস্কৃতির চর্চাও করেছেন। এইসব লিপিতে সারা ভারতে কত যে আদিবাসী পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছ তার তথ্য আমাদের বিস্মিত করে। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতির দপ্তর থেকে বাংলা লিপিতে সাঁওতালি ভাষায় 'পশ্চিম বাংলা' নামে একটি জনপ্রিয় পত্রিকা প্রকাশিত হয়। হাওড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলা থেকে বাংলা লিপিতে কত পত্র- পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এসবই অভিপ্রেত। এর ফলে লিপি - বিষয়ে জটিলতার অবসান ঘটেছে, অন্যপক্ষে আদিবাসী ভাষা ও সাহিত্যেরও বিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটেছে। অকারণ ভাবাবেগে অভিমান করে থাকলে আদিবাসী ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হবে, আদিবাসী ভাষা ও সাহিত্যকে বহতা নদীর মতো এগিয়ে চলতে হবে- আর তাতেই সমগ্র সমাজের মঙ্গল। বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার মধ্যে কোনো শুভ নেই, কল্যাণ নেই, শ্রী নেই। চাই মানবিক ও মানসিক সেতুবন্ধন।